তেঁতুলতলার ঘাট

(গল্পগ্রন্থ – অসাধারণ)

হারুর আজ আর জ্বরআসেনি। এখন তার মনটাতে বেশ স্ফূর্তি আছে। জ্বর এলে আর স্ফূর্তি থাকে না।কিছু না কিছু নিরানন্দ আসেই। আজ চার মাস ধরে সমানভাবে ম্যালেরিয়া জ্বর, পেট-জোড়া পিলে আর সর্বদাই ভয় ওই বুঝি জ্বর এল !

অনেকেই ওকে দেখে বলে—ইস্ ! ছেলেটার মৃত্যুদশা হয়েছে একেবারে ! এবার বুঝিবা সরে !

এসব বলত এমন সব লোকে, যারা ওকে ভালোবাসার চোখে দেখে না। যে ভালোবাসার চোখে দেখে সে কি এমন কথা বলতে পারে ! হারুও তা বুঝত, বুঝে চুপ করে থাকত। জ্বর আসাটা যেন ওর মস্ত অপরাধ, এজন্যে সে একদিকে যেমন বাড়িতে বাবা ও পিসিমার, অন্য দিকে পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছেও অপরাধী।

ওর মা বলে—সকলের হাড় জ্বালালি তুই বাপু, কারু সোয়াস্তি নেই তোর জন্যে।

অথচ কেমন সুন্দর দিনগুলি। সুনীল আকাশ, অদ্ভুত ধরনের সুনীল আকাশ। ঝলমলে রোদ পড়েছে পথঘাটের দুধারে বনে ঝোপে। রাস্তাঘাট এখনো খটখট করচে। আজ দিন কুড়ি একদম বৃষ্টি বন্ধ। চাষারা রোজ গাজিতলায় রোজ-পালুনি করচে। আল্লা আল্লা বলে মাঠে বুক চাপড়ে চিৎকার করচে, বৃষ্টির চিহ্নও নেই। মেঘই নেই আকাশে তার বৃষ্টি। ধান এবার হবে না সবাই বলচে।

এই সব দিনে প্রত্যেকে ঝোপে, প্রত্যেক লতার তলায় যখন রোদ পড়ে, যখন মউটুসকি পাখি বন-চন্দনা লতার আগায় মুখ উঁচু করে দোল খায়, কটুগন্ধ ঘেঁটকোল ফুলের দল ঝোপেঝাড়ে ফোটে, তখন ঘর আর বার একাকার হয়ে যায়, ঘরে মন বসে না।

হারু তখন পাশের বাড়ির চুনুর আর মন্টুর বাড়ি যায়।

মন্টু মায়ের জন্যে ডাঁটা শাক তুলচে ওদের বাড়ির সামনের ক্ষেতে। ওকে দেখে বললে—কিরে, আজ জ্বর আসেনি তোর ?

যেন তার জ্বর আসাটা প্রভাতকালে সূর্যোদয়ের মতো একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। কেন যে ওরা জ্বরের কথাটা মনে করিয়ে দেয় ! হারু বললে—না, জ্বর কিসের ?চল বেড়িয়ে আসি।

—মাকে ডাঁটাগুলো দিয়ে আসব। তুই একটু দাঁড়া।

—এ ক্ষেত করেচে কে ?

—তুই জ্বরে পড়ে ভুগবি, দেখতে তো আসবি নে ?এবার এ ক্ষেত আমি করেচি। মা বললে, ডাঁটা করে রাখ জমিটাতে, তাই জমিটা করলাম।

হারুর মনে দুঃখ হল বার বার তার জ্বর আসার উল্লেখ করাতে। একবার এত রাগ হল, ভাবল সে বেড়াতে যাবে না কারুর সঙ্গে। একাই সে পথে পথে আগেও খেলা করত, এখন জ্বর হওয়ার পর থেকে মনটা কেমন হয়ে পড়েচে, একা বেড়াতে ভয়-ভয় করে, আগে যে সাহস ছিল, এখন আর সেটা নেই। নয়তো মন্টুর মতো সঙ্গীকে সে গ্রাহ্য করে না।

দুজনে অবশেষে বেরিয়ে গেল নদীর ধারে। কাঠ-কাটা নৌকা এসেচে পুব দেশ থেকে, বড় বড় গুঁড়ি পড়ে আছে এদিকে ওদিকে। বর্ষাকালে অনেক গুঁড়ির গায়ে তেলাকুচো লতা উঠেচে, দু'একটা তেলাকুচো ফলও ফলেচে।

কি মায়া যে জায়গাটার !

হারুর বড় ভালো লাগে। খেলা করবার মতো জায়গা।

মন্টু ও হারু কতক্ষণ সেখানে খেলা করলে, খেলা করবার উৎসাহ কারো কম নয়। তেলাকুচো লতার ফল মন্টু তুলতে গেলে হারু তুলতে দিলে না। কেন, বেশ তো দুলচে লতার আগায়, একটা আধপাকাও হয়েচে,

তুলবার কি দরকার ?বেশ দেখাচ্চে গাছে। বেনে-বউ জোড়ায় জোড়ায় বেড়াচ্চে কালকাসুন্দে গাছের ঝোপে ঝোপে।

কতক্ষণ কেটে গিয়েচে দুজনের কারো খেয়াল নেই।

মন্টু কাছে গিয়ে বললে—অমন করে বসলি কেন রে ?জ্বর এল নাকি ?

—নাঃ—

—দেখি গা—ওরে বাসরে, গা যে পুড়ে যাচ্চে—বাড়ি যা বাড়ি যা—

হারু বিমর্ষভাবে বললে—তুই জ্বরের কথা অত করে মনে করিয়ে দিলি কেন ?আমি ভুলে ছিলাম বেশ। যেমন তুই মনে করিয়ে দিলি, অমনি আমার জ্বর এল।

মন্টু বললে—না, না রে, তোর এমনিও জ্বর আসত, আমি মনে করে দেওয়ার জন্যে কি আর জ্বর এল ?ও তোর ভুল কথা। চ, বাড়ি চ—

বাড়িতে আজ চিংড়ি মাছ দিয়ে ডাঁটার চচ্চড়ি হচ্চে সে দেখে এসেচে। কলাইয়ের ডাল দিয়ে ওই চচ্চড়ি দিয়ে ভাত খেতে যে লাগে !

মাকে না বললেই হল যে জ্বর হয়েচে। মন্টুকে পথ থেকেই সরিয়ে দেওয়ার জন্যে বললে—তুই বাড়ি যা—আমি একা যেতে পারব—

—যেতে পারবি ঠিক ?

—খুব। ভারি তো একটুখানি জ্বর, ও এখুনি সেরে যাবে। তুই যা—

হারু বাড়ি ফিরে দেখলে রান্না এখনো হয়নি। কিন্তু দেরি করতে গেলে চলবে না, সে জানে এর পরে এমন ভীষণ কম্প উপস্থিত হবে যে রোদে গিয়ে বসতেই হবে, নয়তো লেপ মুড়ি দিয়ে গিয়ে শুতে হবে। গায়ে কাঁটা দেবে, বমি হবে। সুতরাং ভাত যদি খেতে হয় তবে আর দেরি করা উচিত হবে না, এখুনি খেতে বসা উচিত।

মা জ্বর এসেচে বুঝতে পারলেই সব মাটি। আর ভাত দেবে না। ও রান্নাঘরের দোরে দাঁড়িয়ে নির্বিকারভাবে বলে—মা, ক্ষিদে পেয়েচে।

—কোথায় গিয়েছিলি রে সকালবেলা ?

—খেলা করছিলাম নদীর ধারে।

ইচ্ছে করেই সে মন্টুর নাম করলে না। যদি এরা তাকে ডেকে পাঠায় বা এমনি কিছু, তবে সে বলে দেবে জ্বরের কথা। সে বললে—ভাত দাও ক্ষিদে পেয়েচে—

—আজ এত তাড়া কেন ?

—আমার যা ক্ষিদে পেয়েচে !

—এখনো চচ্চড়ি হয়নি। শুধু ডাল আর ভাত নেমেচে।

—তাই দাও, তাই দিয়েই খাব—

ভাত খেতে বসে হারুর মনে হল, না খেতে বসলেই ভালো হত। জ্বর চেপে আসছে। শীত এত বেশি করচে যে রোদে না বসলে আর চলে না। উঃ, দাঁতে দাঁতে লাগচে এমন শীত ! ভাত খেয়েই সে গিয়ে বাড়ির পিছনে নিমগাছটার তলায় রোদে বসল। একটু পরে ওর ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপুনি ধরল,এদিকে রোদে পিঠ পুড়ে যাচ্ছে, কেমন একটা ঘোর-ঘোর-ভাব ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলেচে। হারু বুঝলে ভীষণ জ্বর এসেছে ওর।

ওর মা বললে বসে আছিস কেন রোদে ?শরীর খারাপ হয়নি তো ?

—হুঁ।

—হুঁমানে কি ?জ্বর আসচে ?সরে আয় ইদিকে দেখি, পোড়ারমুখো ছেলে, তবে ভাত খেলি কি মনে করে ?এমন করে ভুগে মরবি কদ্দিন ?

বেশ ! যেন তারই দোষ। তার যেন ইচ্ছে যে রোজ জ্বর আসে। বাপ-মায়ের অভ্যেস সব দোষ ছেলের ঘাড়ে চাপানো।...হুঁশ হল যখন ওর আবার, তখন বেলা গিয়েচে। রাঙা রোদ কাঁটাল গাছটার মাথায়। শালিক পাখির দল ভাঙা পাঁচিলের ওপর কিচ্ কিচ্ করচে। ওর মুখ তেতো হয়ে গিয়েচে, মাথা ভার, চোখে কেমন ঝাপসা ভাব।

ও বললে—কি খাব মা ?

—কি আবার খাবি ?ভাত খেয়ে জ্বর এসেচে, খাবি কি আবার ?সাবু করে দেব রাত্তিরে।

হারু নাকিসুরে বললে—না, সাবু আমি খাব না—হুঁ-উ-উ—

—না সাবু খাব না, তোমার জন্যে আমি পিঠে-পুলি করি ! চুপ করে শুয়ে থাক।

ভোররাতে ঘাম দিয়ে হারুর জ্বর ছেড়ে গেল। তার পর ঘুম ভেঙে যায়। শরীর খুব হালকা মনে হয় এবং খুব ক্ষিদে পায়। অত রাতে আর কে কি খেতে দেবে, সে চুপ করে শুয়ে থাকে ভোরের আশায়। ভোরের আলো খড়ের দেওয়ালের মাথা দিয়ে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও মাকে ডাক দিতে লাগল।

ওর ঘুমকাতুরে মা চোখ না মেলেই এপাশ ওপাশ ফিরে বলতে লাগল—বাবাঃ, সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পরে একটু যে শোব সে জো নেই। একটু চোখ বুজিয়েছি অমনি ষাঁড়ের মতো চিৎকার !—হাড় ভাজা-ভাজা হয়ে গেল !

হারু নাকিসুরে বললে—সঁবে চোঁখ বুজেচো বুঝি। রোদ উঠে গিয়েচে গাছপালার মাথায়। আমার ক্ষিদে পেয়েচে—উঠে দ্যাখো কত বেলা—

অবশ্য এও অতিশয়োক্তি। রোদ ওঠেনি, সবে ভোরের আলো ফুটেচে মাত্র। ওর মা ওঠবার বিশেষ কোনো আগ্রহ দেখালে না। ছেলের এ নাকিসুরে চিৎকার সকালবেলার দিকে—এ নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। হারু খানিকটা কান্নার পরে আপনি চুপ করে।

বিছানা ছেড়ে উঠতেই বেশ আনন্দ লাগে। আজ কি সুন্দর দিনটা ! কেমন পাখির ডাক বাঁশ গাছের মগডালে। কাল মা বলছিল আজ কুমড়োকাটা সংক্রান্তি। যে যার গাছ থেকে যা পারবে চুরি করবে—শসা, লাউ, কুমড়ো—যার যা ইচ্ছে, কেউ কিছু বলতে পারবে না বা সাহসও করবে না।

অন্য কিছু নয়, গানি বুড়ির উঠোনের মাচায় সেই যে শসা গাছ ! চমৎকার শসার জালি দুলচে কঞ্চির আড়ালে আড়ালে। কতবার লোভ হয়েচে ওর, কিন্তু বুড়ি বড় সতর্ক। আজ ওবেলা রাতের অন্ধকারে একটা দা হাতে গোটা-পাঁচ ছয় শসার জালি আর গোটা শসাকে যদি সাবাড় করা যায়—

উৎসাহে বিছানা ছেড়ে সে উঠে পড়ল।

মন্টুদের বাড়ি গিয়ে এখুনি পরামর্শ করতে হবে। খাওয়ার কথা সে ভুলেই গেল। এত কান্না, এত অনুযোগ যে খাওয়ার জন্যে !

এক ছুটে সে পৌঁছুল মন্টুদের বাড়ি। মন্টু ওর জ্যাঠামশায়ের পাশে বসে সকালবেলা মুড়ি খেতে খেতে ধারাপাত মুখস্থ করছিল। হারুকে দূর থেকে আসতে দেখে সে বিশেষ কোনো উৎসাহ প্রকাশ করলে না, কারণ এখন জ্যাঠামশায়ের হাত এড়িয়ে খেলতে যাওয়া অসম্ভব।

সৌভাগ্যের কথা মন্টুর জ্যাঠামশায় এই সময় তামাক সাজতে গেলেন বাড়ির মধ্যে।

হারু ছুটে এসে বললে—আজ কী দিন মনে আছে ?

মন্টু পেছনদিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত করে বললে—কী দিন ?

—কুমড়োকাটা আমাবস্যে—

—কে বললে ?

—সকলকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখ—

—কি করবি ?

—তুই আর আমি বেরুব। গানি বউয়ের বাড়ি সেই শসা গাছ আছে তো ! আজ রাত্তিরে সব শসা—কি বলিস ?

—তুই এখন যা, জ্যাঠামশায় আসচে, ওবেলা আমি তোদের বাড়ি যাব।

হারু সতৃষ্ণ নয়নে ওর মুড়ির দিকে চেয়ে বললে—কি খাচ্ছিস ?

—মুড়ি।

—দে না একগাল ?

এবার হারুর কানেও জ্যাঠামশায়ের খড়মের শব্দ পৌঁছেচে। সে তাড়াতাড়ি কাপড়ে অকারণ ডান হাতখানা মুছে মন্টুর সামনে পেতে বললে—শিগ্‌গির দে, তোর জ্যাঠামশায় আসছে। পরক্ষণে একমুঠো মুড়ি মুখে পুরে দিয়েই সে ছুটে পালাল। মনে ভাবলে—বুড়ো এসে পড়লেই বকত, আমায় দেখতে পারে না মোটে। কি কেপ্পন মন্টুটা ! একগাল মুড়ি কত কটা দিলে দ্যাখো— দিব্যি মচমচে মুড়ি—

তারপর সে বাড়ি পৌঁছে দেখলে তার মা সামনের উঠোন ঝাঁট দিচ্চে। খাবার দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা ও উদ্যোগ কিছুই নেই এ বাড়িতে।

মা ওই এক রকমের লোক হারু জানে। অন্য লোকের মায়ের মতো নয়। কাল রাতে যেখাইনি, জানে সবই, দাও না বাপু খেতে সকাল সকাল। কাণ্ডখানা বেশ। একটু বেলা হলে মা যদিও খেতে দিলে, সে মাত্র একবাটি সাবু। সে প্রতিবাদ করতে গেলে ওর মা ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো—হ্যাঁ তোমাকে নুচি ভেজে দিই, পিটেপুলি গড়িয়ে দিই, কাল সারারাত জ্বরে শুষেছ কিনা।

যেন জ্বর না হলেই মা তাকে লুচি ভেজে আর পিঠেপুলি করে খাওয়ায় আর কি ! সে এ বাড়িতে নয়। এ বাড়ির বাঁধা আছে চালভাজা, তিনশো-ত্রিশ দিন। লুচি !

কিন্তু ভাত ?মা কি আজ ভাতও খেতে দেবে না নাকি ?কথাটা সে ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলে।

—ভাত খাওয়ার সময় আমায় সেই গাওয়া ঘি একটু দিতে হবে কিন্তু—

—ভাত খাবে কে ?

—কেন, আমি !

—ইস্ ! বলে, কত সাধ যায় রে চিতে, মলের আগায় ঘুণ্টি দিতে—সারারাত জ্বরে কোঁ কোঁ করে ওনার ভাত না খেলে চলবে কেন ?

—কি খাব তবে ?

—শিউলিপাতার রস তো খেলি নে সকালবেলা। একটু বেলা হলে দেব অখন পাতা বেটে—আর সাবু।

হারু মিনতির সুরে বললে—না সাবু নয়, দুখানা রুটি, মাছের ঝোল দিয়ে। তোমার পায়ে পড়ি মা—পুরনো জ্বর তো, ওতে কিছু হবে না।

—আচ্ছা যাক্, দেখব অখন।

সুতরাং মনে আর একবার খুশির ঢেউ উঠল হারুর। শরীর তার খুব হালকা হয়ে গিয়েচে, জ্বর না এলেও পারে। সকলে বলে শরীর হালকা হয়ে গেলে জ্বর আর নাকি হয় না। সে একা মাঠের ধারে বোষ্টম বাগানের পথে বেড়াতে গেল। ও বাগানের খুব নিবিড় একটা ঝোপঝাড়ের মধ্যে আছে সেই বুড়ো মাদার গাছটা। একবার রজুন কাকার দলে মিশে সে গিয়েছিল সেখানে। রজুন কাকা অদ্ভুত লোক, বড় বয়সের ছেলে, ওর গোঁফদাড়ি বেরিয়ে গিয়েছিল, তবু ও তাদের সঙ্গে খেলতো। কত নতুন নতুন খেলা শিখিয়েছিল। তার দলে খেলতে বেরুলে শুধুই মজা, কত রকমের মজা। কিন্তু রজুন কাকা চলে গেল কোথায়, একদিন হঠাৎ কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল এ গাঁ থেকে, দুবার পুজো এসেছে গিয়েচে তারপর—আর আসেনি।

মাদার গাছটা খুঁজে পাওয়া গেল না। ভিজে ঝোপ-ঝাপ—কত পটপটি ফল দুলচে গাছে গাছে। বড় বড় পটপটি ফল। আজকাল সব ছেলেই বর্ষাদিনে পটপটি ফল ছোঁড়ে, তাদের শিখিয়েছিল সেই রজুন কাকা। একটা বাঁশের চোঙের মধ্যে পটপটি ফল পুরে একটা কাঠি দিয়ে ঠেলে দিলেই ফট-ফটাশ ! যেন বন্দুকের শব্দ ! তাই ওর নাম পটপটি ফল।

আজকাল সবার হাতে দেখো একটা বাঁশের চোঙ আর কাঠি আর পটপটি ফলের গোছা। রজুন কাকা না থাকলে আজ আর কাউকে পটপটি ছুঁড়তে হত না।

দুটো বড় বড় তিৎপল্লার ফুল ফুটেছিল উঁচুতে। লতার আগে দুলচে। হাত বাড়িয়ে নাগাল পাওয়া যায় না। এক থোলো পটপটি ফুলই নিয়ে যেতে হবে, কিন্তু বহু চেষ্টা করেও সে কোনোটাই সংগ্রহ করতে পারলে না। বেলা হয়েচে অনেক, ক্ষিদেও বেশ পেয়েচে।

বাড়ি গিয়ে রুটি আর মাছের ঝোল খাবে—কি মজা। এতক্ষণ রুটি হয়েও গিয়েচে। সে রোগা মানুষ, মা নিশ্চয়ই তার জন্যে আগে করে রাখবে ! আজ সে বেশ ভালো আছে, আজ আর জ্বর আসবে না। জ্বর বোধ হয় সেরে গেল। একটু একটু খুব সামান্য শীত বোধ হচ্চে, কিন্তু সেটা জ্বরের দরুন নয়। বর্ষাকাল, আর এই বনঝোপে তো রোদ পড়ে না তাই, মন্টুরও শীত করত, যদি সে আজ এই বনে ঢুকত।

হারু ঝোপের বার হয়ে ছায়াবহুল সরু বনপথ ছেড়ে চওড়া রাস্তায় এসে দাঁড়াল। এই চওড়া রাস্তা ওদিকে নাকি কেষ্টনগর পর্যন্ত চলে গিয়েচে, বাবার মুখে সে শুনেচে। একসারি ধান-বোঝাইগরুরগাড়ি মন্থর গতিতে আসচে ওদিক থেকে। হারু একটা পিটুলি গাছের তলায় আধ-রোদ আধছায়ায় বসে বসে গরুরগাড়ি দেখতে লাগল।

বোধ হয় একটু বেশিক্ষণ বসা হয়ে গেল। যে সময় উঠবে ভেবেছিল, সে সময় ওঠা হল না। রোদটা বেশ মিষ্টি লাগচে। না, জ্বর হয়নি তার। বর্ষাকালে রোদ সকলেরই ভালো লাগে।

বাড়িতে যখন সে পৌঁছল, তখন বেলা বারোটা। হাতে তার গোটাকতক পিটুলি ফল। ওর মা বললে—ওমা, ই কি কাণ্ড ! ই বলে গেলি ক্ষিদে পেয়েচে, আমি কখন রুটি করে বসে আছি ! কোথায় ছিলি ?ভালো আছিস তো ?

—হুঁ—

—কোথায় ছিলি ?

—মাদার পাড়তে গিয়েছিলাম বোষ্টমদের বাগানে।

—জ্বর হয়নি তো ?

—না—

কিন্তু ওর কথার ধরন আর চোখ-মুখের ভাব ওর মায়ের কাছে ভালো বলে মনে হল না। কাছে ডেকে বললে—তোর চোখ মুখ রাঙা দেখাচ্চে কেন রে ?ইদিকে সরে আয়, গা দেখি—বাপরে, গা পুড়ে যাচ্চে ! যা শুয়ে পড় গিয়ে, আর খেতে হবে না।

যখন ওর জ্বরের ঘোর কাটল, তখন রাত হয়েচে। হারু চোখ মেলে চেয়ে দেখলে তক্তপোশের কোণে দেওয়ালের গা ঘেঁষে রেড়ির তেলের পিদিম জ্বলচে, ঘরে কেউ নেই। জ্বর ছেড়ে গিয়েচে। তখনকার ক্ষিদে এখনো রয়েচে। সে কিছু খায়নি দুপুর থেকে। মা কোথায় গেল ?সে ক্ষীণস্বরে ডাকলে—ও—মা—আ—আ—

কেউ উত্তর দিলে না। মা রান্নাঘরে কাজ করচে বোধ হয়, কিংবা হয়তো পাশের নিতাই কাকার বাড়ি গিয়েচে।

একটু পরে ওর মাকে সন্তর্পণে পা টিপে টিপে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেখে ও একটু অবাক হয়ে গেল। মা অমন করে হাঁটচে কেন ?আমসত্ত্ব চুরি করবে নাকি ?সে তো আমসত্ত্ব চুরি করবার সময় অমনি...মা এসে ওর মুখের ওপর ঝুঁকে দেখতে গেল। চোখ তাকিয়ে থাকতে দেখে যেন একটু অবাক হয়ে গিয়ে নরম মোলায়েম সুরে বললে—বাবা হারু ! কেমন আছ বাবা ?

—ভালো।

—দেখি ?

ওর গায়ে হাত দিয়ে ওর মা তাড়াতাড়ি বলে উঠল—ওঃ, কি ঘাম ঘেমেচিস ! এঃ, সব যে ভিজে গিয়েচে ! হারুও তা লক্ষ্য করলে বটে। কাঁথা ভিজে সপসপ করচে। ও বললে—মা আমার ক্ষিদে পেয়েচে।

—ক্ষিদে পেয়েচে বাবা ?আচ্ছা দেব এখন। আহা বাবা আমার, সোনা আমার, শোও। আসচি আমি।

মা ঘর থেকে চলে গেলে ও ভাবলে মা এমন নরম হয়ে গেল কেন ?অন্য সময় মা তো খেতে চাইলে বলে ওঠে—জ্বর ছাড়তে না ছাড়তে ক্ষিদে ! ছেলের কেবল ক্ষিদে আর খাই খাই, জ্বর হয়েচে, চুপ করে শুয়ে থাক !

কিন্তু মা আজ অমন মিষ্টি, অমন মোলায়েম সুরে কথা বলচে কেন ?পা টিপে টিপে হাঁটা—হঠাৎ হারুর মনে পড়ে যায় আজ না সেই কুমড়োকাটা আমাবস্যে ! ওঃ, ভালো কথা মনে পড়েচে। এখন সবে সন্ধে, তার তো জ্বর ছেড়ে গিয়েচে, এইবার মন্টুকে ডেকে নিয়ে গানি বুড়ির বাড়ি শসা চুরি করতে যেতে হবে। আরো একটু রাত হোক, ততক্ষণ সে খেয়ে নিক।

ওর মা একটু বার্লি নিয়ে ঘরে ঢুকে বললে—এটুকু খেয়ে নাও তো বাবা ! উঠো না, শুয়ে থাকো লক্ষ্মী ছেলে—ও লক্ষ্মী ছেলে আমার—

ও বিস্মিত সুরে বললে—কেন, আমার সে ওবেলাকার রুটি ?আমি খেয়ে শসা কাটিয়ে যাব এক জায়গায়।—আজ কুমড়োকাটা আমাবস্যে যে ! জানো না ?

ওর মা বিষণ্ণভাবে ঘাড় নেড়ে বললে—খুব জানি বাবা, তুমি শোও। কুমড়োকাটা আমাবস্যে গিয়েচে কাল—তুমি এই দুদিন ধরে বেহুঁশ। মা মঙ্গলচণ্ডী, সারিয়ে দাও মা, সেরে গেলে পুজো পাঠিয়ে দেব বটতলায়—

জোড়হাতে বটতলার উদ্দেশে ওর মা প্রণাম করে।